Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 264–271
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সন্মাত্রানন্দের 'ধুলামাটির বাউল' গ্রন্থে প্রকৃতি প্রসঙ্গ

দেবশ্রী পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : debasreepaul22@gmail.com

Keyword
সন্মাত্রানন্দ, ধুলামাটির বাউল, সন্মাত্রানন্দ ও প্রকৃতি, বাউল, মনুনদী, মনু বাউলানি, ধুলামাটির পথ, সাহিত্যে প্রকৃতি

Abstract
সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে প্রকৃতি আজও নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের পথ নিরন্তর অতিক্রম করে চলেছে। ঠিক যেভাবে মানবাত্মা জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অবিরাম দেহ পরিবর্তন করে চলেছে। আসলে কেউই থেমে নেই সে প্রকৃতিই হোক বা মানুষ, কারণ সকলের অন্তরে 'বাউলসত্তা' বিরাজমান। প্রকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা যেমন নারীকে উপমা রূপে ব্যবহার করি, সেভাবেই প্রকৃতির এই বাউলসত্তাকে তুলে ধরার জন্য তার গভীরে লুকিয়ে তিন উপাদানের প্রসঙ্গ গদ্যকার এখানে নিয়ে এসেছেন। অতএব মনুনদী-মনু বাউলানি-ধুলামাটির পথ লেখককে ঘর থেকে পথে নামিয়েছেন কীভাবে, সেই আলোচনাই স্থান পেয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে।

মানুষের মধ্যে চির লুকায়িত এই বাউলসত্তা যখন সুপ্ত থেকে জাগ্রত অবস্থায় আসে তখন তাঁর মধ্যে আত্মানুসন্ধানের প্রবণতা দেখা যায়। আত্মানুসন্ধানের এই খোঁজ তাকে 'একা' করে দেয়, আর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে প্রকৃতিকে। তখন প্রকৃতিই হয়ে ওঠে তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী। প্রকৃতির মধ্যে থেকে প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আত্মানুসন্ধানের করতে গিয়ে লেখকের অনুভবে ধরা পড়ে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা। এই অনুভূতির স্পর্শে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকসত্তার আড়ালে থাকা শিল্পসত্তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই এই শিল্পী রামকৃষ্ণ কীভাবে সাধক হয়ে উঠেছেন তা অবশ্যই জানার অপেক্ষা রাখে। আবার যে মানুষটি মুখ ও মুখোশের ভেদাভেদ করতে পেরেছিল বলে তাঁকে প্রভু যীশুর প্রেম প্রচারের পথে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কীভাবে সেন্ট ফ্রান্সিস মুক্ত প্রেম প্রচার করেছিলেন, সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধটিতে। যতন মন্ডলের জীবনে কিসের জন্য 'Being' এর থেকে 'Becoming' গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক নিজেই যেন অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছিলেন। এছাড়াও অচিনপুরের মানুষ অবোধ মাঝির জীবন দর্শন, মাটির রঙের তাৎপর্য, মধুবাবু'র মধু ও মৌমাছিদের প্রতি গভীর ভালোবাসা দেখে তাকে প্রকৃতি প্রেমিক মনে হয়, অথচ এই মানুষটিকে আবার সকলের কাছে প্রত্যাখাত হতে দেখি, এই বৈপরীত্যের কারণ খোঁজারও চেষ্টা রয়েছে আমাদের আলোচনায়। অতএব সমগ্র আলোচনা জুড়ে প্রকৃতি রূপের সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়,বরং সেই প্রকৃতিকে অনুভূতি সহকারে, তার গভীরে

প্রবেশ করে তার মনন সমৃদ্ধ, প্রজ্ঞাশীল রচনাকে নিজেদের মত করে আহোরণ করাই আমাদের আলোচ্য বিষয়টির মূল লক্ষ্য বলা যেতে পারে।

Discussion

সৃষ্টির ক্ষুদ্র সংস্করণ হল মানুষ। তাই সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মানুষের জীবনে প্রকৃতির অবদান অনেক বেশি। প্রকৃতির মধ্যে থেকে প্রকৃতিকে অনুভব করে সে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে বলেই প্রকৃতির পুনর্নির্মাণ হয় তার চিন্তাভাবনায়-সৃজনশীলতায়। মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত জনবসতিপূর্ণ এলাকা কলাগ্রাম, যার পাশ দিয়ে বয়ে চলা স্বচ্ছোতোয়া কুবাই নদী সন্মাত্রানন্দের শৈশব জীবনের দুষ্টুমিকে মেনে নিলেও তাঁকে নিজের কাছ ছাড়া করেনি কখনও। তাই জন্মদাত্রী মায়ের থেকেও অনেক বেশি আপন হয়েছে তাঁর কাছে প্রকৃতি মায়ের কোল। প্রকৃতি মায়ের টানে তিনি চারদেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে আকাশ-বাতাস-জল-আলো-মাটির সংস্পর্শে থেকে নিজেকে জানবার উদ্দেশ্যে যৌবনে অজানার পথযাত্রী হয়েছিলেন। বৈরাগ্যময় জীবনই তাঁকে 'সন্মাত্রানন্দ' নামের পরিচিতি দিয়েছে। এই পথে চলতে গিয়ে তিনি নিজের অবচেতনে থাকা শৈশবের নদীটিকে খুঁজে পান মনু নদী নামে নিজের চিন্তাস্রোতে, যার থেকে বর্হিপ্রকাশ ঘটে তাঁর অসাধারণ সব সাহিত্য সৃষ্টির। 'ধুলামাটির বাউল' তেমনই একটি সৃষ্টি।

১

'ধুলামাটির বাউল'-এ প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা এক পরিব্রাজকের আত্মানুসন্ধান করে চলা পথের আখ্যান নির্মিত হলেও বইটির বাহ্যিক রূপ যথেষ্ট মনোগ্রাহী। মৃত্তিকার গেরুয়া রঙে আপামর রঞ্জিত প্রচ্ছদটি পাঠকের হাতের স্পর্শে এলে তার মন তৎক্ষণাৎ বাউল (বাউন্ডুলে) হয়ে উঠতে বাধ্য। আর এরই মাঝে মাটির ঘরের একটি জানলা, জানলার চারপাশে চালগুড়ি দিয়ে আঁকা আলপনা আমাদের গ্রামবাংলায় দেখা বাড়ির কথা মনে করাবে। জানলার ঠিক মাঝ বরাবর লেখা 'ধুলামাটির বাউল', যা বেশ অর্থবহ মনে হয়েছে আমার কাছে। সেই অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ খোঁজার চেষ্টা চলেছে এই পরিসরে।

সন্মাত্রানন্দ একদিনে 'সন্মাত্রানন্দ' হয়ে ওঠেন নি। সেই না-হওয়া থেকে হওয়ার পথের ইতিহাসটার দিকে একবার আলোকপাত করা যাক। কৈশোরকালে এই বালকটিকে 'তার বাউল' হওয়ার ডাক দিয়েছিল মনু বাউলানি। সেই ডাকে ছিল কাউকে আপন করার, কারোর কাছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাওয়ার আর্তি। সেই ডাককে বালক অবুঝের মতন প্রত্যাখান করেছিল। কারণ সে তো তখনও বালক, আর সেই বালকের মন তো কিছু পাবার পরিবর্তেই কিছু দিতে চাইবে। এটাই যে বালক মনের ধর্ম, সে খবর বাউলানি রাখত। আর সেজন্যই তার একান্ত নিজের জিনিসকে সে বালকের মনের মত করে বালককে দিতে চেয়েছিল- গহিনগাঙের ঢেউ, ভাঙা পথের ধুলো, নীল আকাশের তারা, মৌরী ফুলের সুবাস, একতারার সুর, নামের ঝুলি আর অচিনপুরের মানুষ। যা বাউলানির একান্তই নিজের জিনিস, গল্পকার যৌবনে সেগুলোকেই তাঁর 'পথ চলার মন্ত্র' মনে করতেন,যে মন্ত্রে তিনি বালক বয়সেই দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই দীক্ষা আসলে ঘর ছেড়ে পথে নামার মন্ত্র,বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রজ্ঞা, অজানা থেকে জানার পূর্ণতা। তিনি অনুভব করেছিলেন, ঘর আর বাহিরকে এক করে দিয়েই এই বাউলানি-

> "ফসলের খেতের বুক চিরে যে লালমাটির পথটা দিগন্তের দিকে চলে গেছে, বাবলার হলুদ ফুলে ভরা আনত শাখা থেকে ধুলার অঙ্গনে খেলা করতে নেমেছে খঞ্জন, সেই পথের ধুলা গায়ে মেখে বাউলানি চলে গেল তার খঞ্জনিতে সুর তুলে। অনেকদূরে যেখানে আকাশটা নীচু হয়ে চুম্বন করছে মাটিকে, যেখানে ঝাপসা হয়ে এসেছে নিসর্গের দৃশ্যাবলী, ধীরে ধীরে সেইখানে সে একটা অচিনে গাছের মতো মিলিয়ে গেল।"[১]

লেখক তাঁর উত্তরজীবনে এই একই নামের একটি নদীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই মনুনদীর সূত্র ধরে একদিকে যেমন আমরা বাউলানির কথা পাই, তেমনই পাই ধুলো মাখা পায়ের নীচের পথকে। আর এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে সাহিত্যিক তাঁর বৈরাগ্যময় জীবন গদ্যের ছবি এঁকে চলেছেন।

এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি, মনুনদী হল এই সাহিত্যিকের নিজস্ব একটি নদী। যেমন করে প্রত্যেক মহাপুরুষ ও কবিদের একটি করে নদী আছে। যেমন রামের সরযূ, কৃষ্ণের যমুনা, বুদ্ধের নৈরঞ্জনা, কালিদাসের শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী, ভর্তৃহরির নর্মদা, মধুসূদনের কপোতাক্ষ, রবীন্দ্রনাথের পদ্মা, জীবনানন্দের ধানসিড়ি, বিভূতিভূষণের ইছামতি ইত্যাদি। সন্মাত্রানন্দের জীবনে নদীটির গুরুত্ব বুঝতে হলে নদী সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি বলেছেন,

> "নিজের ভেতর যে একার উৎসার, তার কাছে সরে আসার বার্তা পেয়েছেন এই নদীটির কাছে।...মনে নদীর স্রোত শোনবার আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা-উন্মাদনা নিয়ে যে মানুষ নিজের কাছে সরে আসে, সেই নিভৃত জীবন তারই হাতে তুলে দেয় তারই নিজের জীবনের ঐশ্বর্য।"[২]

এছাড়াও তিনি মনে করেন,নদীর ভয়ঙ্কর রূপই তো তার আসল রূপ। ভয়ঙ্কর রূপের অনুভূতি না থাকলে নদীর রূপের পূর্ণতা অনুভূত হয় না। এই জীবননদীও ভয়াবহ, যারা একমাত্র স্বার্থশূণ্য তারাই এই মৃত্যুরূপা মাতাকে, এই নদীকে জীবনের মধ্যে জানতে পারে। জীবন ও জগতের যে রূপ তা নদীর মত প্রবাহমান। তাই A Stream of Consciousness কে নদী বলা হয়। অতএব নদীর ভয়ঙ্কর রূপই হল মঙ্গলময় যা আমাদের অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বৃহত্তর মানব মনের সুপ্ত অনুভবকে জাগ্রত করে। তাই লেখক তাঁর সমস্ত রচনা মনুনদীর নামে উৎসর্গ করে নিজেকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সন্মাত্রানন্দ, তাঁর অন্যান্য সাহিত্যের মত এই গদ্যসংগ্রহে, নদীর মত পথকে শুধুমাত্র শব্দজালে আবদ্ধ করে রাখেননি, তাকে রূপক করে তুলেছেন। এখানে 'পথ' জীবনের চলমানতা ও আত্মানুসন্ধানের প্রতীক। বাউলানির বাউল হয়ে যৌবনে যখন তিনি ঘর ছাড়া হয়ে পথভোলা পথিক হয়েছেন তখন থেকেই তাঁর সেই অন্বেষণ শুরু। তাই সমগ্র গদ্যসংগ্রহের মোট ৫৫ টি গদ্যের মধ্যে প্রথম ২০টি গদ্যের সমষ্টিকে 'ধুলামাটির বাউল' নাম দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট ৩৫টি গদ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে 'ধুলামাটির ঘরবাড়ি'। অর্থাৎ বাউল হয়ে পথে নেমে পথের ধারে জুটে যাওয়া মানুষজন, চলার পথে নানান ধরণের অভিজ্ঞতা, দৃশ্যাবলী এবং সেখান থেকে উঠে আসা ভাবনা নিয়েই গল্পের আদলে তৈরি হয়েছে প্রথম অংশটি। এই পথ আমাদের চিরপরিচিত প্রেমের পথ, সেই পথে বাউল নিজেকে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে চলতে চলতে অবশেষে এসে পৌঁছান 'ধুলামাটির ঘরবাড়ি' তে। ঘরটি যেহেতু ধুলামাটির তাই এর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। যদিও বাউলকে একবার ধরা পড়তে হয়েছিল এই ঘরে তবুও,

> "এই আটকে-পড়াকে বাউল অভিশাপ হিসেবে নয়, চলমান জীবনকাব্য হিসেবেই দেখেন। একদিকে তিনি যেমন মরমিয়া সাধক, অন্যদিকে কবিও। আকাশের পাখি গাছের ডালে এসে বসে, পৃথিবীর টানে ধরা পড়ে কিছুদিন, তারপর আবার নীলাকাশের ডাক শুনে শূণ্যে উড়ে চলে।"[৩]

২

আমরা সবসময়ই দেখেছি, সন্মাত্রানন্দের সাহিত্য সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়তায় ভরপুর। 'ধুলামাটির বাউল'এ তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এখানে লেখকের লেখনীতে বিষয় বৈচিত্র্য নয়, ধরা পড়েছে একজন গল্পকারের দৃষ্টিতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা। যদিও তাঁর প্রতিটি লেখায় প্রকৃতির স্পর্শ আছে তবুও প্রকৃতি মায়ের টানে ঘরছাড়া এই মানুষটির কাছে প্রকৃতি যেন অন্যভাবে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতি দেবীর এই বিশেষভাবকে জানার জন্য 'প্রকৃতিসম্বোধন', 'ফ্রান্সিস অব আসিসি', 'মাটির রং', 'মাধুকরী ভিক্ষা', 'প্রসাদপুর', 'যতন মন্ডলের জীবন', 'আশ্চর্য চোখ দুটি', 'মনুনদী', 'প্রকৃতিপ্রণয়ব্যথিত',গল্পগুলোকে আমি আমার আলোচনার মধ্যে এনেছি। এছাড়াও 'বেলুড় মঠের নৈশ রূপ', 'নীড়', 'আমতলির সন্ধ্যাকাল', 'বর্ষাবিকেলে', গল্পগুলোর মধ্যে প্রকৃতির নিসর্গ শোভার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

'ধুলামাটির বাউল' গদ্যসংগ্রহের শুরুটা হয়েছে 'প্রকৃতিসম্বোধন' গল্প দিয়ে। এখানে প্রকৃতি কখনও নারী আবার নারী কখনও প্রকৃতি হয়ে ধরা দিয়েছে। তাই বাউল তাঁর একতারাতে সুর তুলে গেয়ে উঠলেন,

> "হয় না পিরিতির সাধন পরকিতি বিনে-"[৪]

কী এই 'পিরিতির সাধন'? আর কেন তা প্রকৃতি ছাড়া হয় না? 'পিরিতি' হল মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম। বাউলেরা এই প্রেম মার্গেই সাধন-ভজন করে থাকেন। কারণ প্রেমের সাধনা হল সহজ সাধনা। তাই সহজকে (তুরীয়ানন্দ বা সম্পূর্ণ জ্ঞান)পেতে হলে সহজ মার্গে চলা আবশ্যক। এই মার্গে যুগলেরা একে অপরের দেহমুকুরে লুকিয়ে থাকা মনের মানুষেরই সাধনা করে থাকেন। এখানে 'প্রকৃতি' সম্বোধনে প্রধানত নারীর কথাই বলা হয়েছে। সাধনাতে আমরা নারীর উপস্থিতি প্রথম লক্ষ্য করি শাক্ত সাধনায়। সেখানে নারী, শক্তির প্রতীক রূপে গৃহীত হয়েছে। তবে প্রকৃতি রূপে নারীকে গ্রহণ করার বিষয়টি বৈদিক সমাজে ছিল না। কারণ তখন মানুষের জীবন নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল শিকার ও পশুপালন। পুরুষকেন্দ্রিক জীবিকার জন্য প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলো বৈদিক মানুষের আক্রমণেই ধ্বংস হয়েছিল। পরবর্তীতে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারতে খুঁজে পাওয়া অত্যাশ্চার্য দেবীমূর্তি দেখে মনে করা হয়, কৃষিকাজ মেয়েদেরই আবিষ্কার। আর এই বিশ্বাস থেকেই সন্তান-উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা এবং ফসল-ফলার ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা-এই দু'এর মধ্যে একটা গভীর যোগ থাকাই স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। শাক্ত সাধকরা তাই নারীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে, মেয়েদের প্রকৃতি বলে পুজো করে। তাই মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা শাক্তদের কাছে প্রকৃতি মায়ের অসম্মান করা। এ তো হল 'বামাচার'এর কথা, যা স্ত্রী-আচার বা বেদ বিরুদ্ধ। কারণ বৈদিক আচার হল পুরুষ প্রধান। লেখক যেহেতু একজন বেদান্তবাদী সেহেতু তাঁর সাধনায় প্রকৃতি হল,

> "ওই নদী-এই আকাশ-এইগাছপালা-মানুষ-আকাশজোড়া কত তারা— এই বিরাট ব্রক্ষাণ্ডই তো আমার প্রকৃতি! এর সঙ্গেই আমার লীলা। এই বিরাট প্রকৃতিই আমার সাধনসঙ্গিনী।"[৫]

কেউ সাধনসঙ্গিনী রূপে প্রকৃতির পুজো করেন, কেউ বা নারীর পুজো করেন। অতএব প্রকৃতির মধ্যেই লেখক এই 'ইটারনাল ফেমিনাইন' বা 'শাশ্বত নারীত্ব'এর সার্থকতা লক্ষ্য করেছেন।

যেখানে মানব জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেখানে সাহিত্যের উপস্থাপনায় প্রকৃতি ও পরিবেশ অনায়াসেই এসে যায়। এই উপস্থাপনা করতে গিয়েই সাহিত্যিককে হতে হয় একা এক নির্জন দ্বীপের অধিবাসী। সেখানকার প্রকীর্ণ অক্ষরমালায় লেখা হয়েছে তাঁর,

> "একা হওয়ার অর্থ, প্রকৃতির নিরালা আবেষ্টনীর মধ্যে বসে মনের এমন একটা অবস্থায় পৌঁছনো বা পৌঁছনোর চেষ্টা, যে অবস্থায় অন্য কারও কথা মনের ভিতর ওঠাপড়া করবে না। নিজের ভেতর যে নীরবতার সংগীত বয়ে চলেছে, তাকেই কান পেতে শুনতে হবে। মন শান্ত হয়ে যাবে, প্রকৃতি জননীর উদার স্নেহের স্পর্শ অনুভব করা ছাড়া অন্য কোনো অনুভব সেখানে থাকবে না। ...সবার কাছে সবার মানুষ হয়ে ফিরে আসব বলেই কখনো কখনো নিজের কাছে ফেরা দরকার।"[৬]

এই ভাবেই সন্মাত্রানন্দ একদিন নিজের নিভৃত জীবনের কাছে ফিরে এসেছেন। আর সঙ্গে করে এনেছেন তাঁর অনুভূতির স্তরে স্তরে প্রকৃতির স্পর্শকে। সেই স্পর্শের সান্নিধ্যে থেকেই তিনি অনুভব করলেন, সাধকরূপের আড়ালে থাকা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পী সত্তাকে। বালক রামকৃষ্ণ অনেক ছোট থেকেই প্রকৃতির সৌন্দর্যশ্রীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে অপার্থিব অপরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই তিনি শিল্পী। অতএব তাঁর এই সৌন্দর্য অবলোকন, সেখান থেকে শিল্পসত্তার জাগরণ এবং অনুভূতির উচ্চসীমায় পৌঁছনোর যে পর্যায়ক্রম,তার স্পষ্ট বর্ণনা ফুটে উঠেছে গদ্যকারের গদ্যাংশে। সেখানে বলা হয়েছে,

> "যে সংবিতের সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাঁর প্রথম সমাধি হয়েছিল, শাস্ত্রে সেই অনুভবকে নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়। ...কিন্ত শাস্ত্রে যে পথের কথা স্পষ্টভাবে নেই, সেই পথ দিয়েই এই বালক অনুভূতির সাম্রাজ্যে উত্তীর্ণ হলেন। জপ-তপ করে নয়, শুধু সুন্দরের প্রতি মুগ্ধ আবেশে মগ্নপ্রাণ হয়ে, প্রকৃতির অপরূপ নিসর্গশোভার ভিতর

> তন্ময় হয়ে হারিয়ে গিয়ে বালক রামকৃষ্ণ উপনীত হলেন সেই অপার্থিব অনুভবে, যা একদিন ঋষিরা অনুভব করেছিলেন।"[৭]

এই অনুভব একজন শিল্পীর কাছে যেমন, একজন সাহিত্যিকের কাছে ঠিক তেমনই। দেখতে গেলে সাহিত্যিকও অনুরূপ শিল্পসত্তার ধারক এবং বাহক। সেজন্যই তিনি প্রকৃতির গূঢ় রহস্য অনায়াসেই উন্মোচন করতে পারেন, অনায়াসেই 'মুখ ও মুখোশ' এর ভেদাভেদ সম্মুখে আনতে পারেন। কারণ আড়ালে থাকা প্রকৃত মুখের চেয়ে কৃত্রিম মুখোশের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে তা ক্ষণস্থায়ী। যিনি এই ভঙ্গুরতাকে আপন করতে পারেন নি, তিনি হলেন সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসি। এই শিকড়হীন মানুষটি তাঁর প্রভু অর্থাৎ যীশুর কথা শোনাতেন শহরের নিতান্ত ছা-পোষা হতদরিদ্র মানুষদেরকে। কিন্তু অচিরেই বিরতি ঘটল তাঁর এই মুক্ত প্রেম প্রচারে। ছেদ টানল সামাজিক যাজকদের প্রাতিষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা,

> "ফ্রান্সিস যেন কোনোদিন আর মানুষের সামনে জিশুর কথা না বলেন। যে তাঁর কথা শুনবে, সেই শ্রোতার তৎক্ষণাৎ মৃত্যুদণ্ড হবে।"[৮]

যদিও তাঁকে কেউ প্রেম প্রচারে বিরত রাখতে পারেনি। আপাত অর্থে তিনি তো শিকড়হীন মানুষ, তবে মানুষের মধ্যে সৃষ্টির শিকড় যেহেতু নিহিত রয়েছে সেহেতু প্রকৃতির টান তিনি অন্তরে ঠিকই অনুভব করেছিলেন। তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁকে শিকড়হীন মনে হলেও গহিন মনের ভেতর দিয়ে তিনি ঠিকই পৌঁছেছিলেন সেই পাথুরে জমির কাছে, বসতেন ঠিক লাইলাক গাছের নীচটিতে। এই বর্ণনা পড়ে আমি অনুভব করতে পেরেছি খন্ডিতের সাথে পূর্ণাত্মার মিলনের মত বিস্ময়কর অনুভূতিকে–

> "আঁধারের চাঁদোয়া থেকে বাতাসের মত ছায়ামেদুর পাখি নেমে আসত কোলে, কেউ কাধেঁ, কেউ বা পিঠে। ফ্রান্সিস জানতেন, তারা কেন নেমে এসেছে এখানে এই সন্ধ্যাবেলায়।"[৯]

অতএব শহরের কংক্রিটময় জীবনের কাছে নয়, স্নিগ্ধ গ্রাম্য প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা জীবদের মধ্যেই ফ্রান্সিস প্রেম প্রচার করেছিলেন।

সাহিত্যই কি শুধু ইতিহাসকে ধরে রাখার কাজ করে চলেছে? এমনটা সন্মাত্রানন্দ মনে করেন না বলেই হয়তো গ্রাম্য প্রকৃতি-মাঠ-ঘাট-নদী-আকাশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন তিনি পলাশির যুদ্ধ, ভাস্কর পন্ডিতের মারাঠি বর্গি সেনার আক্রমণ, টিলার উপরে পাতার কুটিরে বসে শবরপাদের চর্যাপদ লেখা, বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ অতীশের তিব্বত যাত্রার মতন নানা ইতিহাস মিশ্রিত চিত্রকল্পকে। তাই প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বীকারোক্তি,

> "...জানাতে পারে না বলেই তো অপরিজ্ঞাত ইতিহাসের সেই অন্ধকার সমুদ্রের ভিতর থেকে সৃজনশীল কল্পনা তার আলো ফেলে ফেলে মননের মুক্তো তুলে আনতে পারে...।"[১০]

এইভাবে প্রকৃতির প্রভাবে আমাদের মানসপটে যে বৌদ্ধিক দার্শনিকতারূপ চিন্তার জাল বিস্তৃতি লাভ করে, তাকে যেন বন্য মাকড়সার লালারসে বোনা জালের মতই মনে হয়। আবার ফুলে ফুলে মৌমাছির মধু সংগ্রহ দেখে যে শিশুমন আপ্লুত হয়ে উঠত পারমাত্মিক জীবনে সেটাই 'মাধুকরী ভিক্ষা'য় রূপান্তরিত হল। যে মাটির ধুলিকণা গায়ে মেখে শিশুরা নিজেদের শিশুত্ব উপলব্ধি করত, সেই শিশুরাই একদিন পরিব্রাজক হয়ে ভিক্ষুবৃত্তির উদ্দেশ্যে গাত্রে ধারণ করে মৃতদেহের পরণের কাপড়। যা দিনের পর দিন মাটিতে পরে থেকে মৃত্তিকার রঙে রঞ্জিত হয়ে অনুভব করায় শরীরের অন্তিম পরিণতির কথা।

এরূপ প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে জীবন উপলব্ধির সন্ধানে যখন লব্ধ বস্তুকে পাওয়ার পরিবর্তে বড় হয়ে ওঠে চলার পথের প্রশ্নেরা তখনই 'Being' এর থেকে 'Becoming' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ 'Being' যেখানে বর্তমান অবস্থাকে নির্দিষ্ট করে, সেখানে 'Becoming' নির্দেশ করে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ক্রমবিবর্তনের ধারাকে। আর

এই ক্রমবিবর্তনের ধারা প্রসঙ্গে গদ্যকারের বিশেষত মনে হয়েছে যতনদা ওরফে যতন মন্ডলের কথা। এই যতনদাকে নিয়ে তিনি লিখলেন জীবনের গণনাতীত অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম একটি অধ্যায়। তাই সন্মাত্রানন্দের কাছে জীবনটা হয়ে উঠেছে গল্প বা উপন্যাস বলার মতন এক গল্প-ভাঙ্গার গল্প। যদিও মূল বিষয়টি হল আত্মগত। যতনদা মানুষটি যখন তাঁর কাছে এক একরকমভাবে ধরা দিয়েছে, তখন গদ্যকারের মনে হত, হয়তো জীবনটা এরকমই হয় বা অন্যরকম কিছু অথবা আলাদা কোন এক প্রকারের। যেভাবে তিনি যতনদাকে কখনও উদাসীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন সুকান্ত সেতুর উপর, আবার কখনও গেরুয়া জোব্বা পরে বসে থাকতে দেখেছেন হৃষিকেশ আশ্রমে, কখনও বা সাদা কাপড় পরে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখেছেন কাসাঁইয়ের চরের দিকে, সেভাবেই হয়তো যতনদা উদাসীন জীবনের গল্প ভেঙ্গে লিখতে চেয়েছেন বৈরাগ্য জীবনের গল্প কথাকে এবং সেই গল্প ভেঙ্গে তিনি আবার অনন্ত চলার পথের গল্প রচনা করে গেছেন। যাকে কোনো সীমার মধ্যেই ধরে রাখা যায় না। অনুরূপভাবে লেখকও হয়তো তাঁর যতনদাকে দেখে 'Being' থেকে 'Becoming' হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন, সেখানে আছে বাঁধা না পাওয়ার আনন্দ। 'যতন মন্ডলের জীবন' গদ্যটিতে 'Being' আর 'Becoming'এর ফারাক সন্মাত্রানন্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। একদিকে লেখকের স্বগোক্তি,

> "আমার ওঠা আর নামা! শালগাম চিত করে বসালেও সোজা, কাত করে বসালেও সোজা।"[১১]

অন্যদিকে যতনদা বলছেন,

> "দেখি না, কী আছে জীবনে। একটাই তো জীবন। অন্যরকম করে বেঁচে দেখি না কেমন লাগে, কী পাই।"[১২]

তাই জীবাত্মার দেহ পরিবর্তনের মতই জীবনের পথ চলাতেও পরিবর্তন হওয়া আবশ্যিক মনে করেই আদিগুরু শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'নৈব মুক্তি নঃ মেয়' অর্থাৎ সেই পরিবর্তনে আছে বন্ধন ও ভাঙ্গনের মধ্যেকার স্থির এক অনন্ত গোধূলি লগ্ন। এমন একটা সময় যেখানে বিকেলও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি অথচ সন্ধ্যা ও নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। এই আভাসটাই ভেসে উঠেছে আলোচ্য গদ্যে, যা গদ্যকার সন্মাত্রানন্দের জীবনের হয়তো অপর এক সম্ভাবনা হতে পারত। সন্মাত্রানন্দের বর্ণনায় যে প্রকৃতিকে আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে প্রাত্যহিক দৃশ্য অনেক বেশি আমাদের নজর কেড়েছে। সেখানে প্রকৃতির ভীষণ আটপৌরে রূপ। ছোটবেলার গ্রামবাংলার প্রকৃতিকে খেলার সঙ্গী রূপে পেয়ে তার নদীর জলে সাঁতার কেটেছেন সাহিত্যিক অথচ বড়বেলার প্রকৃতিও তাঁকে একইভাবে সঙ্গ দিয়েছে। সেজন্যই হয়তো স্কুলের 'রশিযুদ্ধ' এ জিতেছিলেন শুধুমাত্র মাঠের গঠনগত তারতম্যের জন্য। এই জয়লাভের জন্য প্রকৃতির অবদান যে চোদ্দআনা আছে তা বুঝতে পেরে স্কুলের এক ক্ষুদে পড়ুয়া তাঁকে বলে,

> "ওই যে আমাদের মাঠটা। আমাদের মাঠটা ঠিক সমতল নয়। মানে ওটা ঠিক হরাইজন্টাল নয়! মাঠটা একটু ইনক্লাইন্ড প্লেন। মানে জলট্যাংকের দিকটা উঁচু, আর জঙ্গলের দিকটা নীচু। জলট্যাংকের দিক থেকে জঙ্গলের দিকে মাঠটা ঢালু আছে। তুমি বুদ্ধি করে প্রথমেই ঢালুর দিকটা, মানে জঙ্গলের দিকটা বেছে নিয়েছিলে। একটু টান মারলেই জলট্যাংকের দিক থেকে অপোনেন্ট তো এমনিতেই জঙ্গলের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।"[১৩]

লেখক যে শুধু প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখে উপলব্ধি করেছেন এমনটা নয় বরং প্রকৃতির সঙ্গে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে থাকা মানুষদেরও একইভাবেই অনুভব করতে পেরেছেন বলেই অবোধবন্ধু দাস তাঁর গল্পে হয়েছে 'অবোধ মাঝি'। সেই মাঝি শুধুমাত্র দুটি পাড়ের মধ্যে মানুষের যোগাযোগের সেতুবন্ধন গড়ে তোলে না, তার গ্রামে আসা অচিন মানুষদের সঙ্গেও অনায়াসেই যোগসূত্র তৈরি করতে পারে। তাই অচিন মানুষ সম্পর্কে মাঝির স্বগোক্তি,

> "আসে মধ্যি মধ্যি আমাদের গেরামে। তেনারা সব অচিন মানুষ। বে-থা করে না। ঝে ঝা দ্যায়, তাই খায়। যেকেনে সেকেনে রাত্র কাটায়। ঘর নাই, বাড়ি নাই। চালচুলা নাই। সোন্দর সোন্দর কতা কয়। গান গায়। আবার কখুন ঝে চলি যায়, কেউ বলতি পারে না।"[১৪]

অতএব অবোধ মাঝির মুখে অচিন মানুষের এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শুনে মনে হয়, সে নিজেও বোধ হয় এমনটাই। অচিন মানুষ অবোধবন্ধু। মাঝি যেমন অচিন মানুষ হয়েও মানুষের ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পেরেছে। এর ঠিক বিপরীতে মধু ও মৌমাছির কথা শুনিয়ে সকলকে উত্যক্ত করার জন্য মধুবাবু বলেন,

> "আমি যখন আইয়া পড়ছি, মৌমাছিরাও আইয়া পড়ব। বক্সের ভিতর চিনি বিস্কুট রাইখা দিছি। চিনির লুভেই মৌমাছি এক্কেরে পালে পালে আইতাছে।"[১৫]

অতএব প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকলেও 'মধুবাবু'র সবকিছু মধুর নয়, সেজন্য তাকে অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এইভাবেই সন্মাত্রানন্দ, তাঁর প্রকৃতিকে আধ্যাত্মিক-দার্শনিক-হাস্যরস-ভালোবাসার নানান মোড়কে বেঁধে বৈচিত্র্যময় গল্প ফেঁদেছেন তাঁর এই গদ্যসংগ্রহে।

সন্মাত্রানন্দের 'ধুলামাটির বাউল' গল্পগ্রন্থে প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়তার যে দিকগুলোর কথা অত্যন্ত সাদামাটাভাবে বলা হয়েছে, প্রকৃত অর্থে বিষয়টা কিন্তু ততটা লঘু নয়। আসলে প্রকৃতি মায়ের কাজই হল প্রকৃতির মধ্যে অনবরত বৈচিত্র্যময়তা তৈরি করে চলা। সেই কারণে প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে দিয়েই মানব সন্তানরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, পাপ-পুণ্য, সুন্দর-কুৎসিতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে। আর সেই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় প্রকৃতির ভয়ানক রূপ দেখে। যা নিজের অহংবোধকে চূর্ণ করে বিস্মৃত আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করায়। আমাদের প্রকৃতি নিঃশব্দে এই কাজ সম্পন্ন করে যায় এবং বারবার জীবন পথে হারিয়ে যাওয়া পথিকদের পথ দেখাতে প্রবৃত্ত হয়। তাই বাহ্যিক রূপের বিচার দিয়ে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধির আবেদন থাকে হৃদয়ের গভীরে, বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায়, ও বোধ শক্তির কাছে।

তথ্যসূত্র :

১. সন্মাত্রানন্দ, 'ধুলামাটির বাউল', ধানসিড়ি, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ২৪
২. সন্মাত্রানন্দের সাক্ষাৎকার, 'নদী ও নিভৃত জীবন', 'Educational and Cultural Station', Link : https://youtu.be/FH6a_IVj3n4
৩. সন্মাত্রানন্দ, 'ধুলামাটির বাউল', ধানসিড়ি, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০২১, ভূমিকা
৪. সন্মাত্রানন্দ, 'ধুলামাটির বাউল', ধানসিড়ি, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২১, পৃ. ১৫
৫. ঐ, পৃ. ১৬
৬. ঐ, পৃ. ২৫১
৭. ঐ, পৃ. -২৬২
৮. ঐ, পৃ. -১৫২
৯. ঐ, পৃ. -১৫২
১০. ঐ, পৃ. ১১২
১১. ঐ, পৃ. ১১৪
১২. ঐ, পৃ. ১১৪
১৩. ঐ, পৃ. ২০৫
১৪. ঐ, পৃ. ৯৬
১৫. ঐ, পৃ. ১৮৭

আকর গ্রন্থ :

১. সন্মাত্রানন্দ, 'ধুলামাটির বাউল', ধানসিড়ি, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০২১

সহায়ক গ্রন্থ :

১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, 'লোকায়ত দর্শন', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৩

সহায়ক পত্রিকা :

১. 'আলোচনাচক্র', সম্পাদক- চিরঞ্জীব শূর, পয়ত্রিঁশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পঞ্চাশতম সংকলন, জানুয়ারি, ২০২১